জামায়াতের প্রেমের ফাঁদ, অতঃপর

শাহানা জামালী।।

‘প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বয়ে যায় নয়নে।’

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটি তার বিখ্যাত গীতিনাট্য ‘মায়ার খেলা’র অন্তর্গত একটি প্রেমের গান। গানটির ভাবগত অর্থ এবং গীতিনাট্যে ব্যবহারের উপযোগিতা যাই হোক এমন ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা আদৌ ভাবিনি। অথবা কবিগুরু নিজেই কি আগাম ভেবেছিলেন যে আজ আমরা যারা লেখালেখির চেষ্টা করি তাদের লেখার সুবিধার্থে কাজে লেগে যেতে পারে, এমনও হতে পারে। কবিগুরুর এমন অনেক কবিতা-গান লেখার কাজে সহায়ক হিসেবে যে কাজ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই, যেন অব্যর্থ সর্বজ্বরহর বটিকা।

গত ৬ থেকে ৮ জুলাইয়ে দৈনিক ‘যুগান্তর’-এ প্রকাশিত একটি নারী নির্যাতনের ঘটনার খবরে দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। এ ধরনের ঘটনাবলি অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের বিনোদনের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তাৎক্ষণিক কষ্ট দেয়, আবার মর্মাহতও করে। অনেক সময় সেই সংবাদের ফলোআপ সংবাদ না থাকায় পাঠক এক সময় তা ভুলেও যায়। নিত্যদিনের খবরের কাগজের পাতা উল্টালে এ ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনা নিত্যপাঠ্য এবং নিত্যবিস্মৃতি। কিন্তু ঘটনার নায়ক স্বয়ং বগুড়ার ধুনটের জামায়াতের আমির। প্রেমের ফাঁদে ফেলে একটি মেয়ের সর্বনাশ এরপর নামকাওয়াস্তে বিবাহ সম্পন্ন করে তাকে অস্বীকার এবং অত্যাচারের মধ্য দিয়ে সম্পর্কের ইতি টানার পাশবিক নাটক। প্রথমে সাহায্যের হাত বাড়ানো। এতিমদের সাহায্য করলে আল্লাহ খুশি হবেন তাই এতিম মেয়েটিকে চাকরি দেয়া, নিয়মিত বাড়িতে যাতায়াত করে বাড়ির সবার বিশ্বাস অর্জন, অবশেষে আরও ভাল চাকরির প্রলোভনে রাজধানীর বোর্ডিংয়ে তোলা। মেয়েটির সম্ভ্রমহানি এবং সবশেষে প্রহসনমুলক বিয়ে। সবকিছু মিলিয়ে মেয়েটিও এই পাতানো প্রেমের ফাঁদে পতঙ্গের ন্যায় আত্মাহুতি দিয়ে এখন হাসপাতালে ধুঁকছে। সকল গরব টুটে গিয়ে নয়নে সলিল বইছে। মেয়েটি অবশ্য আদর্শগত দিক থেকে ঝাঁকের কই অর্থাৎ মহিলা জামায়াতের কর্মী। আমার বিষয়টি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির উদ্দেশ্য মেয়েটি নয়, জামায়াতে ইসলামীর আমির হুজুরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উপজীব্য করে আরও কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা। যার মধ্য দিয়ে পাঠকমহল ওয়াকিবহাল হবেন আমাদের ধর্মের ধ্বজাধারী ধর্মের লেবাস পরিহিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের ভেতরের কুৎসিৎ এবং ভয়ঙ্কর চেহারা সম্পর্কে।

ঘটনা-১

আমার মেয়ে তখন নার্সারি ক্লাসে পড়ে। আমাকে মেয়ের জন্য প্রায়ই স্কুলে গিয়ে বসে থাকতে হতো। কিন্ডার গার্টেন স্কুলের সামনে প্রচুর মায়েরা অপেক্ষমাণ থাকে তাদের সন্তানদের জন্য। সেখানে সময় স্থবির বলেই অনেক মায়েদের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা হতে হতে কারও কারও সঙ্গে সম্পর্কটা আন্তরিকতার দিকে গড়ায়। এরকম একটি মাকে বললাম আস না কেন

আমার বাড়ি? উত্তরে সে জানাল কী করব ভাবি, মেয়েদের নিয়ে বাড়ি ফিরে রান্না-বান্না সংসার সবকিছু সামলিয়ে আর কোথাও যাওয়ার সময় হয় না। তাছাড়া বিকেলের দিকে সময় পেলেও বড় মেয়েটাকে কোরান শরিফ পড়াতে আসেন একজন। আমি জিজ্ঞেস করলাম কোরান পড়ানোর শিক্ষক পুরুষ? মা-টি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ঠিক কাজ করোনি। তোমার মেয়ে বড় হচ্ছে। ক'দিন পর ওই হুজুর তোমার মেয়ের গায়ে হাত দেবে। এর ঠিক ৫-৬ দিনের মাথায় মেয়েকে নিয়ে স্কুলে গেছি, আমাকে দেখে ছুটে এসে ওই মা বলল ভাবি, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। কী রকম! উত্তরে যা জানাল তা এ রকম হুজুর পড়াতে পড়াতে এক সময় মেয়েটির শরীরে হাতে দিতেই মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে মা ছুটে গিয়ে দেখে হুজুরের কাণ্ড। তারপরের ঘটনা হলো মহিলা তার স্বামীর প্যান্টের বেল্ট খুলে নিয়ে হুজুরকে বেধড়ক পিটিয়ে বের করে দিয়েছে।

ঘটনা২

মেয়ে এখন মাধ্যমিক স্কুলে পড়ে। কালে-ভদ্রে স্কুলে যায়। মেয়ের পরীক্ষা হলে প্রতিদিন। এই পরীক্ষা চলাকালীন স্কুল কমপাউন্ডে প্রচুর মায়েদের সমাগম ঘটে। অনেক কথোপকথনের মাঝে একদিনের বিষয়বস্তু ছিল হুজুর। আমার অভ্যাসই হলো সুযোগ পেলে এই ধর্মের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে কিছু বলা। একটি মা এই আলোচনার মধ্যে ঢুকে বলল আর বলবেন না ভাবি, হুজুররা এমনই বদ। আমি বললাম, কেন কী হয়েছে? উল্লেখ্য, এখানে ভিকটিম ছেলে বাচ্চা। হুজুর কোরান শরিফ পড়াতে আসার কয়েক দিনের মাথায় এই বাচ্চা ছেলেটি আর পড়তে চায় না। মাকে বলে আমি ওই হুজুরের কাছে আর পড়ব না। মা যতই ছেলেকে কোরান শরিফ পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, ছেলে ততই জেদ করে পড়বে না বলে। অবশেষে অনেক চেষ্টায় ছেলের মুখ থেকে যা উদ্ধার হয় তার মর্মার্থ হুজুরটি সমকামী।

ঘটনা-৩

সীতাকুণ্ডের বারবকুণ্ড ইউনিয়নের মাহমুদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া একটি মেয়ে স্কুল সংলগ্ন একটি বাড়িতে পানি খেতে গেলে ওই বাড়ির কর্তা ব্যক্তিটি মেয়েটিকে কৌশলে বাড়ির ভেতর নিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে আশপাশের লোকজন এবং স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-কর্মচারী ওই ধর্ষণকারীকে ধরে আটকে রেখে থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ইউএনও সাহেব পুলিশ ফোর্সসহ সরজমিন গিয়ে জনগণের রোষানল থেকে উদ্ধার করে নিজেই খানিকটা লাঠিপেটা করে নিজের রোষ মিটিয়েছিলেন। পরে থানায় সোপর্দ করে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে তিনি মামলা করেন। ঘটনাটি আমার প্রত্যক্ষদর্শী এবং ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত এক ব্যক্তির কাছ থেকে শোনা, যা পরে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী ধর্ষক ব্যক্তিটিকে দেখে বোঝাই যায় না যে, সে এরকম একটি কাজ করতে পারে। পঞ্চাশোর্ধ বয়স, নুরানী চেহারা, শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, নামাজ পড়ার দরুন কপালে কালো দাগ রাজটিকার মতো জ্বলজ্বল করছে। তিনি একজন জামায়াতের একনিষ্ঠ কর্মী।

ঘটনা-৪

ক্লাস নাইনে পড়াকালীন এক বুর সঙ্গে তার আত্মীয় বাড়িতে যেতাম প্রায়ই। প্রথম যেদিন যাই সেদিন বাড়ির মহিলাকে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম এত রূপসী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। তার বয়স তখন আমাদের সেই সময়ে সমবয়সী হবে। হুজুর স্বামীটিকে দেখে মনে হলো

বয়স পঞ্চাশোর্ধ। দেখতে কালো ষণ্ডামার্কা দীর্ঘদেহী। তুলনায় স্ত্রীটি শিশুই বলা চলে। যাকে বলে বালিকা বধু। কালো সুতোয় বাঁধা গলায় একমুটো তাবিজ। চোখের নিচে গভীর কালো দাগ। সে যেন এক বিষণ্ন প্রতিমা। মনে হলো যেন এক বন্দি রাজকন্যা কতকাল বন্দি জীবনযাপন করছে। অসাধারণ এক মেলানকলিক বিউটি তার মুখটি ঘিরে। স্বামীটি বলেছিল জিনের আছর আছে। এখন উপলব্ধি করি জিনটি ছিল স্বয়ং তার হুজুর স্বামী।

উপরোক্ত ৪টি ঘটনার প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলেও এই ঘটনাগুলোর মধ্য থেকে একটি বিষয় নিখুঁতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটি নায়ক কোন না কোনভাবে তথাকথিত ধর্মভিত্তিক কোন সংগঠনের কর্মী বা অনুসারী। ধর্মটাকে পুঁজি করে তারা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছে যুগ যুগ ধরে। ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু হয়ে থাকে। ধর্মটাও জীবন ও জীবনযাপনের সঙ্গে এবং প্রাত্যহিক জীবনের মুল্যবোধের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। ধর্মকে যারা একমাত্র পেশা হিসেবে নিয়েছে সেই সব পেশাজীবী ধর্মব্যবসায়ীরা দিনের পর দিন বছরের পর বছর সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে আসছে। সব ধর্মভীরু মানুষেরই তার ধর্মের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস থাকে। যেহেতু সে জানে না তার মৃত্যুর পর সত্যি কী অপেক্ষা করে আছে। অপার্থিব ভাবনার সঙ্গে নিত্য বসবাসের দরুন এক ধরনের মুল্যবোধের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনের কল্পনার সুখানুভুতি ও ভীতি দুই-ই থাকে। কাল্পনিক সুখানুভুতি ও ভীতি দুই-ই ধর্ম ব্যবসায়ীদের পুঁজি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃশ্যকলা বিভাগে বাংলাদেশের একটি ছেলে লেখাপড়া করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন কোলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে তার আকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। ছেলেটির নাম জোসি চৌধুরী। তার প্রদর্শিত অঙ্কিত চিত্রগুলোর মধ্যে একটি চিত্র ছিল এমন একজন হুজুর দীর্ঘ লম্বা দাড়ি, লম্বা জোব্বা, মাথায় টুপি, হাতে তজবি। হাতের বেড়ে চার-চারটি বিবি বোরকা পরিহিত। হেঁটে আসছে তাদের সামলে নিয়ে। হুজুর ভদ্রলোকের মুখ ঊর্ধ্বগামী। ঊর্ধ্বে কয়েকজন হুর পরীর ছবি অঙ্কিত। জাগতিক জীবনে চার-চারটি বিবি থাকা সত্ত্বেও পারলৌকিক জীবনে অনেক নারী প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর চোখ। ছবিটি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। এই ছবির বিষয়বস্তু ছেলেটি তার ধর্মীয় চেতনা থেকে এঁকেছিল কি না তা আমি জানি না। কারণ ছেলেটি ব্যক্তিগত জীবনে খুব ধর্মীয় অনুভুতিসম্পন্ন ছিল।
ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কওমি মাদ্রাসাগুলোতে তাদের শিক্ষাকাল শুরু হয়। পাঠ্যসুচিতে যা থাকে তা অনেকখনি শরীরকেন্দ্রিক নানা উত্তেজক বিষয়াবলি; যা পরবর্তীকালে নিজেদের জীবন চর্চার একমাত্র বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শরীরকেন্দ্রিক যেসব শব্দাবলির সঙ্গে কৈশোরে তাদের পরিচয় ঘটে সেই সব শব্দ সাধারণ স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেলেমেয়েরাও জানার সুযোগ পায় না। নারী শরীরের প্রতি লোভ-লালসার জন্ম হয় এদের অল্প বয়স থেকেই। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে ছেলেবেলা থেকে শরীরকেন্দ্রিক সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করে। তারই নগ্ন ব্যবহার ঘটায় বড় হয়ে ব্যক্তিগত জীবনযাপনে। তাদের সামনে কোন আদর্শ নেই, সৃষ্টিশীল কোন কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও নেই। বিজ্ঞানবোধ নেই। এসব মানুষের দ্বারা রাজ্যের কুকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। গ্রাম্য একটি প্রবচন আছে ‘বাঘের গোবোধ, চোরের কিরে, লুচ্চার মা’ এই তিনে বিশ্বাস করো না। অর্থাৎ বাঘ যখন কোন শিকারের আশায় ওঁৎ পেতে থাকে তখন বাঘের হিংস্র রূপটি প্রকাশিত থাকে না। একটি চোর বারবার চুরি করে ধরা পড়ে যতই প্রতিজ্ঞা করুক, সে আবার চুরি করে। তেমনি নারীলিপ্সু পুরুষ কোন মহিলাকে মা ডাকলেও তার চরিত্র পাল্টায় না। এই প্রবচনটি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হোক বা না হোক, ধর্মের লেবাস পরা

হুজুরবেশী ধর্ম ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শতভাগ সত্য প্রমাণ করে। প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে হুজুর মাত্রই কি এমন চরিত্রের অধিকারী? এর উত্তর আমার জানা নেই। কারণ এই মধ্যবয়স পর্যন্ত আজও কোন সৎ, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম পালনকারী এ ধরনের সাজসজ্জাবিশিষ্ট ব্যক্তি দেখিনি বা চোখে পড়েনি। বরঞ্চ অনেক সাধারণ মানুষকে দেখেছি সৎ, পরিশ্রমী, ধর্মভীরু, ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ এবং আদর্শ জীবনযাপন করতে। বাইরে থেকে তার আচার-আচরণের সঙ্গে কোথাও তথাকথিত ধর্মব্যবসায়ীদের চেহারা পোশাক ও লেবাসে মিল নেই।

এ ক্ষেত্রে **জামায়াতপন্থী মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। তারা ঠিক দুপুর হলেই বোরকা মুড়ি দিয়ে ভুতের মতো বেরিয়ে পড়ে সরলপ্রাণ ধর্মবিশ্বাসী মহিলাদের দরজায় দরজায়। ধর্ম প্রচারের নামে ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় জামায়াতের নারী সংগঠনের কর্মীরা এসব মহিলার কাছে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। তাদের এই ভুল আদর্শের শিকার অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত মেয়েরা।** ২২ জুলাই দৈনিক 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত অমৃতা নায়ারের লিখিত বিষয়টি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় এসব হারুনুর রশিদের বিচার হয় না। আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে আজও ড্যাং ড্যাং করে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানতে পারিনি বগুড়ার ধুনটের নির্যাতিত মেয়েটি এখন কী অবস্থায় আছে। জোট সরকারের আমলে সবচেয়ে সুবিধা ভোগকারী সংগঠন জামায়াতে ইসলামী। শত শত সাধারণ মানুষের রক্তে রঞ্জিত লম্বা জোব্বা, দাড়ি-টুপি নিয়ে ফাঁসির আসামি শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলাভাই কনডেম সেলে থাকার পরিবর্তে জামাই আদরে সাবজেলে আরও হৃষ্টপুষ্ট হয় যে দেশে সে দেশে প্রেমের ফাঁদে ফেলে একটি মেয়েকে ফাঁসিয়ে দিয়ে আমির হুজুর এমন কী অপরাধ করেছে! দেশের মানুষের আইনের প্রতি আর আস্থা নেই। আইনের শাসন নেই, শাসনের নামে আছে সাধারণ মানুষকে প্রেষণ। আমরা পিষ্ট ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার যাঁতাকলেও। সময় এসেছে সচেতন নাগরিকদের এসব দুষ্ট কীট দমনের।

.সং বা দ, সোমবার । জুলাই ২৪, ২০০৬